অতীতের পদচিহ্ন

কলকাতায় প্লেগ : ভগিনী নিবেদিতা ও সমসময়

স্বামী ঋতানন্দ

প্লেগ—মহামারীর অপর নাম। প্লেগ—মৃত্যু তার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। ভাগবতপুরাণেও আছে—''বন্য মৃত মূষিক দর্শন হলে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ও লোকজন পরিত্যাগ করবে।'' বাইবেলেও প্লেগের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১]

খ্রিস্টীয় শতক শুরুর পর পৃথিবীতে তিনটি বীভৎস প্লেগ মহামারীর কথা জানা যায়। প্রথমটি জাস্টিনীয় প্লেগ বলে পরিচিত, ঘটে ৫৪২ খ্রিস্টাব্দে, রোম সাম্রাজ্যে। এতে এক কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়টির সূচনা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে, ইওরোপে। চলে তিন শতক ধরে। আড়াই লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে প্লেগের ভয়াল ও আতঙ্কজনক রূপটি প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে মানুষের মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পাঁচ লক্ষ।[২] ১৮৯৬-এ বোম্বাই শহর প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়। পরে গুজরাট, কচ্ছ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু স্থানে এর তাণ্ডব ঘটেছিল। কলকাতা নগরীও প্লেগের করাল ভ্রূকুটি থেকে রক্ষা পায়নি। ১৮৯৮ সালে কলকাতাবাসী মহামারীর বিভীষিকাময় মূর্তিটি প্রথম দর্শন করে।[৩]

দুই

১৮৯৭-এর ১ মে। স্থাপিত হল রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শ আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক।

১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারি। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ভারতবর্ষের কাজে আত্মাহুতি দিতে পাশ্চাত্য থেকে আগমন ঘটল এক সিংহিনীর। নাম তাঁর মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল।

কেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল? কারণ স্বামীজী ২৯ জুলাই ১৮৯৭-এর পত্রে লিখেছেন : ''ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরকম নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।''

ভারতবর্ষে পদার্পণের আগেই ইস্পাতসম নারীটি উক্ত পত্র থেকে আরও জেনেছেন : ''কিন্তু 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কীরকম, তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। এদেশে আসার পর তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; তারা

শ্বেতাঙ্গদের ভয়েই হোক বা ঘৃণায় হোক, এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের তীব্র ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে ছিটগ্রস্ত মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে।... যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি।

''কাজে ঝাঁপ দেবার আগে বিশেষভাবে চিন্তা করো...।''

ঝাঁপ দিলেন মার্গারেট।

তিন

কলকাতা বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছল। অভ্যর্থনার জন্য বন্দরে উপস্থিত স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর পদপ্রান্তে অবনত মস্তকে এক শ্বেতাঙ্গিনী, এ যেন এক উজানযাত্রার প্রতীকী চিত্র। ব্রিটিশরা এসেছিল ভারতবর্ষকে পদানত করতে। লুণ্ঠন আর শোষণ ছিল তাদের হাতিয়ার। মার্গারেট এলেন অতীত ভারতবর্ষের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে। এলেন দরিদ্র-অশিক্ষিত-শোষিত-পদানত বর্তমান ভারতের সেবায় নিজেকে নিবেদন করতে। এলেন ভবিষ্যৎ ভারতসভার অন্যতম দধীচি হয়ে।

পরম মমতা আর কঠোর দৃঢ়তায় অত্যাশ্চর্য শিক্ষক ভেঙে-গড়ে তুলতে লাগলেন মানসকন্যাকে। অকৃত্রিম মমতা-মাখানো কণ্ঠে জানালেন—''দীন দরিদ্রের অন্তরের সম্পদকে গ্রহণ করবার মতো প্রশস্ত করো হৃদয়কে। তোমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখলে তারা যেন ভাবে, দেবতা এসেছেন ঘরে। ক্ষুধায় জর্জর দীনহীন, কাঙাল ওরা, মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু ওরাই পরমার্থকে এনে দেবে তোমাদের হাতের মুঠোয়, কেননা তোমাদের মধ্যেই তাদের পূজার ঠাকুরকে তারা দেখতে পাবে। এর বিনিময়ে কী তোমরা দেবে তাদের?''[৪] দিতে হবে নিজেকে।

১৭ মার্চ ১৮৯৮। পরম নিষ্ঠাবতী হিন্দুনারী সারদা দেবী তাঁর খুকিকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, গ্রহণ করলেন। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ভারতের হিন্দুসমাজ গ্রহণ করল মার্গারেটকে। এ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন তিনি।

১৮৯৮-এর ২৫ মার্চ। বিবেকানন্দ তাঁর আইরিশ শিষ্যা মার্গারেট নোবলকে যথাবিধি দীক্ষা দিলেন। জন্ম হল 'নিবেদিতা'-র। এবার সামনে এগিয়ে চলা মানে 'নিবেদিতা' নামটির সার্থক রূপায়ণ।

চার

৩০ মার্চ ১৮৯৮। ভগ্ন শরীর পুনরুদ্ধারের জন্য দার্জিলিং যাত্রা করলেন স্বামীজী। নিবেদিতা রয়ে গেলেন নির্মীয়মাণ বেলুড় মঠে মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রমুখের সঙ্গে। ভারতীয় গৃহস্থালির খুঁটিনাটি, ভারতীয় সমাজের ধরনধারণ, রীতিনীতি ইত্যাদি দেখতে লাগলেন, শিখতে লাগলেন। সে হল ভারতীয় ভাবে পরিপুষ্ট হওয়ার সূচনাকাল। শিখতে লাগলেন বাংলা ভাষা। মহাকালী পাঠশালায় বক্তৃতা দিলেন। রাতে চন্দ্রালোকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শন, মঠের ঠাকুরঘরে ধ্যান। নিরন্তর প্রস্তুতি।

মঠ তখন নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। বেলুড় মঠের মূল ভূমিখণ্ডে মঠ স্থানান্তরের কাজ চলছে। স্বামীজী চান এদেশে ও বিদেশে ভাববিস্তারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সৈনিকদের প্রেরণ করতে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রাণপ্রিয় আত্মারামের সেবার কাজ ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারে গিয়ে অকূল পাথারে পড়েছেন। অখণ্ডানন্দজী ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদের মহুলা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ সেবাত্রাণ কার্য সমাপ্ত করে, অনাথাশ্রমের সূচনা করে ফেলেছেন। তখন অবশ্য তিনি স্বামীজীর সান্নিধ্যে।

যদিও ততদিনে ভারতবর্ষের নানাস্থানে দেখা দিয়েছে প্লেগ—মহামারীরূপে। ৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট খোলার পর সেখানে মহারানি ভিক্টোরিয়ার বক্তৃতা হয়। উদ্বোধন পত্রিকার 'সংবাদ ও মন্তব্য'-এ সে-বক্তৃতার রিপোর্ট : ''ভারতবর্ষের

স্থানে স্থানে এখনও প্লেগ বাড়িতেছে; তজ্জন্য তিনি অতি দুঃখিত, তবে—ভরসা দিতেছেন যে—প্লেগাক্রান্তদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, অন্যান্য দেশে রোগবিস্তার রোধের জন্য এবং সমূলে একেবারে তাহার নাশের জন্যও যৎপরোনাস্তি যত্ন করা যাইতেছে।"[৫]

কলকাতায় প্লেগের আবির্ভাবের আশঙ্কা স্বামীজীর মনে আগে থেকেই জেগেছিল। ওই পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে তিনি প্রস্তুতও ছিলেন। ২৯ এপ্রিল পত্রে স্বামীজী ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ''আমি যে-শহরে জন্মেছি, সেখানে যদি প্লেগ এসে পড়ে, তবে আমি তার প্রতিকার-কল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি।"

দার্জিলিং-এ অবস্থানকালে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের তেমন উন্নতি না ঘটায় এবং বিদেশি শিষ্যাদের হিমালয়ের ক্রোড়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকায়[৬] এসময় স্বামীজী কলকাতায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শ্রীমা সারদা দেবী তখন বাগবাজারের বোসপাড়ার ভাড়াবাড়িতে রয়েছেন। শ্রীমায়ের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আশঙ্কা সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতায় দেখা দিয়েছে ভয়াবহ প্লেগ ও মহামারীর আতঙ্ক। ২৯ এপ্রিল প্লেগের সংবাদ জানিয়ে স্বামীজীকে পত্র দিলেন ব্রহ্মানন্দজী : ''কলিকাতায় ৪।৫ দিনের মধ্যে ১০।১২টি plague cases হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৮।১০ জন মারা পড়েছে এবং বক্রি [বাকি] তাহাদের জীবনের আশা খুব কম। Dr. Sasi প্রভৃতি analysis দ্বারা জানিয়েছেন যে real plague. Govt. এখনও বাহিরে কিছু প্রকাশ করেন নাই। শীঘ্রই মন্তব্য বাহির করিবেন। এখন হইতে কলিকাতা হইতে বিস্তর লোক পালাইতেছে। একটা খুব panic হইয়াছে। বোধহয় ২।৪ দিনে অনেক লোক চলিয়া যাইবে।"[৭]

শ্রীমা সারদা দেবীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে স্থান পরিবর্তন বিষয়ে অভিমত জানতে চেয়ে ব্রহ্মানন্দজী ওই পত্রেই লিখছেন : ''অদ্য সকালে যোগেন মঠে আসিয়াছিল শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করিতে। Dr. Sasi এবং আমাদের অনেকের মত যে [তিনি] কামারপুকুরে গিয়া থাকেন। যদ্যপি শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় plague না spread করে এবং বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে আবার আসিবেন। এ বিষয়ে তোমার কি মত জানিতে পারিলে সেইরূপ কার্য করা যাইবে।"

স্বামীজী তাঁর দুর্বল শরীর নিয়ে প্লেগাক্রান্ত সমতলে ফিরে আসুন—এবিষয়ে ব্রহ্মানন্দজীর যেন অমত। তাই আলোচ্য পত্রে পুনরায় লিখলেন : ''তোমার নিজের শরীর যদ্যপি দুর্বল থাকে তাহা হইলে Dr.-কে জিজ্ঞাসা করিয়া নিয়ে [নিজে] আসিবে। যদ্যপি Dr.-রা বলে যে ২।১ দিন অপেক্ষা করিতে, তাহা হইলে না হয় অপেক্ষা করিবে। এখানে আসিয়া তুমি Mrs. Bull প্রভৃতির সহিত America চলিয়া যাও এইটী আমার ইচ্ছা। কলিকাতার report প্রত্যহ তোমাকে পাঠাইব। তুমি সেখানে একটু সাবধানে থাকিবে। আহারাদির কোন প্রকার অত্যাচার যেন না হয়। তুমি কেমন থাক প্রত্যহ একখানা করিয়া চিঠি নিত্যগোপাল দ্বারা লেখাইবে। Mrs. Bull প্রভৃতি তাহারাই বা কি করিবে এ বিষয় তুমি consider করিয়া তাহাদিগকে একখানা চিঠি আলাহিদা লিখিবে।"

কিন্তু কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এ পত্র পৌঁছতে তো দেরি হবে। তাই তড়িঘড়ি পরদিন অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল স্বামীজীকে টেলিগ্রাম করলেন ব্রহ্মানন্দজী : "Plague Calcutta many leaving advise about mother we propose Joyrambati wait darjeeling letter follows."[৮]

লক্ষণীয়, পত্রে শ্রীমাকে কামারপুকুরে পাঠানোর সিদ্ধান্তটি পালটে জয়রামবাটীতে পাঠানোর ইচ্ছা টেলিগ্রামে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্লেগ মহামারীর আক্রমণের নিদারুণ সংবাদ পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর মনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষিত হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ পরবর্তী কালে বলেছেন : ''স্বামীজী অমন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি—একেবারে গম্ভীর। সারাদিন কিছু খেলেন না। চুপচাপ। ডাক্তার ডেকে আনা হল, কিন্তু তাঁরা কোন রোগ নিরূপণ করতে পারলেন না তাঁর; একটা বালিশের ওপর মাথা গুঁজে সারাদিন বসে রইলেন। তারপর শুনলাম, কলকাতায় প্লেগে তিন ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে গেছে—শুনে অবধি এই!''[৯]

৩ মে-তেই কলকাতায় ফিরলেন স্বামীজী। শহরে তখন এমনই আতঙ্কের অবস্থা যে, শিয়ালদহ থেকে বাগবাজার আসতে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া ছয় টাকা লেগেছিল।[১০] মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসী কিন্তু প্লেগ মহামারীর ভয়াল রূপকে মা কালীরই অপর রূপ বলে জানতেন। ওইদিন শ্রীশ্রীমার গৃহে নিবেদিতা ও অপর একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে স্বামীজী তাঁদের বলেছিলেন, ''মা-কালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঐ দেখ, আজ মা প্রজাগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ভয়ে তাহারা কূল-কিনারা দেখিতে পাইতেছে না এবং মৃত্যুর দণ্ডদাতা সৈনিকবৃন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে, ভগবান শুভের ন্যায় অশুভ রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন না! কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁহাকে অশুভরূপেও পূজা করিতে সাহস পায়।''[১১]

পাঁচ

প্লেগ সংক্রমণের উৎস হল সংক্রামিত বন্য ইঁদুর আর একটি বিশেষ ধরনের মাছি—র‍্যাট ফ্লি। মানুষের দেহে খুব দ্রুত এ-রোগের সংক্রমণ ঘটে থাকে এবং তা মহামারীতে পরিণত হয়। মানুষের দেহে এ-রোগের কোনও স্বাভাবিক প্রতিষেধ ক্ষমতা নেই। প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঋতুগত। উত্তর ভারতে এর প্রকোপ সেপ্টেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রকোপ কমে যায়। শহরের ঘিঞ্জি অঞ্চলের বা বস্তির অধিবাসীরা অত্যন্ত নোংরার মধ্যে বসবাস করে বলে এসব স্থানে সংক্রামিত ইঁদুর ও র‍্যাট ফ্লি দ্রুত রোগ ছড়াতে পারে। ব্যাপক আকারে প্লেগ ছড়ানোর আগে সংক্রামিত এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে বীজাণু সৃষ্টিটাই রোধ করা আবশ্যিক। সেই উদ্দেশ্যে বন্য ইঁদুর থেকে মাছি এবং মাছি থেকে মানুষ— সংক্রমণের এই গতিরেখার মধ্যে ভাঙন ধরানো প্রয়োজন। ইঁদুর ও মাছির সংস্পর্শ রোধে প্রয়োজনীয় কীটনাশক প্রয়োগ বাধ্যতামূলক; আর সেইসঙ্গে প্রতিষেধক হিসাবে টিকাকরণের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই টিকাকরণ রোগ প্রতিরোধের জন্য, কখনই নিরাময়ের জন্য নয়। প্লেগের আশঙ্কা থাকলে রোগ ছড়ানোর অন্তত এক সপ্তাহ আগে টিকাটি দুবার দিতে হয়।

প্লেগ তিনপ্রকার : বিউবোনিক (bubonic), সেপ্টিসেমিক (septicaemic) এবং নিউমোনিক (pneumonic)। রোগ সঞ্চার থেকে প্রথম রোগলক্ষণ দেখা দেওয়ার কাল হল—বিউবোনিক। সেপ্টিসেমিক প্লেগের পর্যায়কাল দুই থেকে সাতদিন এবং নিউমোনিক প্লেগের পর্যায়কাল এক থেকে তিনদিন। এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের অভ্যন্তরে দ্রুত রোগলক্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসব বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেগুলি হল—হঠাৎ প্রবল জ্বর, কাঁপুনি, প্রচণ্ড মাথা ধরা, চরম অবসাদ এবং গ্রন্থিস্ফীতিতে অসহ্য যন্ত্রণা ইত্যাদি। কিন্তু অনেকসময় এইসব লক্ষণ পরিস্ফুট হওয়ার আগেই ফুসফুসের প্রদাহ শুরু হয় এবং রক্ত ও স্নায়ুমণ্ডল এই রোগবিষে বিকৃত হয়ে রোগীর দেহ কালো হয়ে যায় এবং অল্পক্ষণেই রোগীর মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে-প্লেগ মহামারী হয়েছিল তা 'কালামড়ক' (Black Death) নামে কুখ্যাত হয়েছিল।

প্লেগ সংক্রমণ ঘটেছে অনুমান করার সঙ্গে সঙ্গে যা যা করণীয় তা হল—রোগীকে সর্বপ্রথম পৃথক স্থানে রাখা, প্লেগ জীবাণুর নির্ণয়করণ এবং যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা শুরু করা। জীবাণু নির্ণয়ের আগেই লক্ষণ দেখামাত্র চিকিৎসা শুরু করা একান্ত আবশ্যক। তা না হলে বিউবোনিক প্লেগের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ রোগীই মারা যায় আর নিউমোনিক প্লেগের ক্ষেত্রে কোনও রোগীই বাঁচে না।[১২]

পরিস্থিতি যখন এতটাই বিপজ্জনক তখন জনগণের ক্ষেত্রে যা প্রথম প্রয়োজন তা হল, প্লেগ নিবারণে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করানো, প্লেগ সংক্রান্ত সবরকম প্রয়োজনীয় কর্তব্য-অকর্তব্য অবহিত করানো। তাদের ভীতি দূর করা, আশ্বস্ত করা। এইসময় যূথবদ্ধ সমন্বয়ে মানুষের পাশে থাকাও সর্বপ্রথম কর্তব্য।

১৮৯৮ সালে কলকাতা প্লেগ সংক্রমণে প্রাণনাশ যতটা না হয়েছিল, তার থেকে বেশি দেখা দিয়েছিল করাল প্লেগ বিষয়ে অজ্ঞতা-জনিত আতঙ্কের ঢেউ। পূর্ব পূর্ব বছরগুলিতে কলকাতায় প্লেগের আক্রমণ না দেখা দিলেও কেবল মহারাষ্ট্রেই ১৮৯৬-এর মাঝামাঝি থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত দেড়বছরে সরকারি হিসাবে প্রায় পৌনে দুলক্ষ মানুষ প্লেগে মারা গিয়েছিল। সেইসময় ব্রিটিশ সরকার প্লেগাক্রান্ত অঞ্চলে প্লেগাক্রান্ত রোগীদের অনুসন্ধান ও প্লেগ নিরাকরণের জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। মহারাষ্ট্রের পুনা শহরে সে-কাজের জন্য ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেশীয় মানুষদের ভাষা, রীতিনীতি, অনুভূতি ও ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা সম্বন্ধে ঘৃণার মনোভাবাপন্ন ওইসব ব্রিটিশ সৈন্য অজস্র অন্যায় আচরণ করেছিল।[১৩] ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রতিনিধিকে ইংল্যান্ডে সাক্ষাৎকারকালে (জুলাই ১৮৯৭) মহামান্য গোখেল জানান : ''...প্লেগ-কমিটির দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে তারা রান্নাঘরে ঢুকে খাবার নষ্ট করেছে, পূজার জায়গায় ঢুকে বিগ্রহের উপরে থুতু ছিটিয়েছে, কিংবা সেগুলি ভেঙে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হতভাগ্য মানুষগুলির সামান্য যা-কিছু সম্পত্তি ছিল, সেগুলিকে সৈন্যরা যথেচ্ছ নষ্ট করেছে।''[১৪] প্লেগ হয়েছে কি না দেখার জন্য ঘরে আলোর অভাব এই অজুহাতে মেয়েদের রাস্তায় টেনে এনে তাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে।[১৫]

'জ্ঞানসাগর' পত্রিকা ১৫ মার্চ ১৮৯৭-এ লেখে : ''Men and women and children are marched off the camp with guards at the back and the front, bare-headed, bare-footed, as if they were a pack of lawless banditti.''—''এই অবস্থায় অনেক মানুষই প্লেগ-হাসপাতালে যাওয়ার চেয়ে ডুবে মরা শ্রেয় মনে করেছে।''[১৬]

১৮৯৭-এর অমরাবতী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পরম রাজভক্ত মাননীয় সি শঙ্করন নায়ার পর্যন্ত বলেছিলেন : ''Soldiers... generally believed to have insulted women. A Hindu lady was assaulted by a soldier... To these and similar complaints... the Mahratta complained, 'Plague is more merciful to us than its human prototypes now reigning in the city.' ''[১৭]

এসব সংবাদ দাবানলের মতোই ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা নগরীর জনগণ এসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল ও আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। ১৮৯৮-এ কলকাতায় প্লেগের সূচনাকালে ব্রিটিশ সরকার প্লেগ নিবারণ ও নিরাকরণের উদ্দেশ্যে কতকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হল টিকাকরণ। কিন্তু রোগ বিষয়ে যথাযথ ধারণার অভাব, শাসকশ্রেণির প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ,

পর্দাপ্রথাতে অভ্যস্ত হিন্দু অন্তঃপুর ও মুসলিম জেনানা মহলে বাইরের লোকজনের অনুপ্রবেশ একেবারেই না-পসন্দ তো ছিলই, উপরন্তু প্রবল বিদ্বেষ, আতঙ্ক, ঘৃণা ও রোষ তাদের গ্রাস করেছিল। ফলে শুরু হয়েছিল সরকারি প্লেগ প্রতিকার সিদ্ধান্তে বাধাদান, বিক্ষোভ, দাঙ্গা আর সেই সঙ্গে পলায়নপর অগণন জনতা। এই হল প্লেগাতঙ্কে বিহ্বল কলকাতার বাস্তব চিত্র।

১ মে ১৮৯৮ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে শ্রীম পত্রে জানাচ্ছেন : ''By the evening of yesterday I think about half of our township had left panic-stricken.''[১৮] উদ্ভ্রান্ত জনতার অবস্থা বিষয়ে কোনও এক ইংরেজি পত্রিকা অথবা সাময়িকপত্রে Calcutta Notes By An English Lady এই শিরোনামে প্রত্যক্ষদর্শী নিবেদিতা ৪ মে লিখছেন : ''সাধারণ মানুষ উদ্বেগে উন্মত্ত। তাদের স্নায়ু-শিরা ছিঁড়ে যাবার মুখে—রুদ্ধ আক্রোশে তারা ফেটে পড়বে যেন—পাছে প্লেগের প্রতিষেধ-ব্যবস্থা চালু হয়ে অন্তঃপুরের গোপনীয়তা নষ্ট হয়, মাতা ও পত্নীদের মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়।''[১৯]

ওই ৪ মে-তেই অমৃতবাজারের সুদীর্ঘ বর্ণনার কিয়দংশ : ''আতঙ্কের রূপ অদৃষ্টপূর্ব। আর কখনো কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা এইরকম প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়নি। যেসব জেনানার মুখ 'সূর্যও দেখেনি', তাঁরাও শহরের পথের উপর দিয়ে দৌড়েছেন, বা ট্রামে-চড়ে পালাতে চেয়েছেন।...

''গতকাল খুব সকাল থেকে সারা শহরে ব্যাপক গোলমালের লক্ষণ দেখা গেছে।... কিছু লোকের হাতে লাঠি, সেগুলি তারা ঘোরাচ্ছিল, কখনো-কখনো কাল্পনিক প্লেগ-টীকাদানকারীর উদ্দেশ্যে সেগুলি হাঁকাচ্ছিল।... নিম্নশ্রেণীর সকল হিন্দু ও মুসলমান একযোগে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল। সারাদিন ব্যবসাবাণিজ্য একদম বন্ধ। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের দোকানপাট গতকাল বন্ধ ছিল। গত কয়েকদিনের বিপুলসংখ্যক মানুষের পলায়ন, সেইসঙ্গে দোকানপাট বন্ধ এবং পথে গাড়ি-ঘোড়ার অনুপস্থিতি—সব মিলিয়ে কলকাতা পরিত্যক্ত নগরীর চেহারা ধরেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত-না সরকার বাধ্যতামূলক টীকাদানের নীতি বরাদ্দ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মঘটীরা ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। যতই তাদের যুক্তি দিয়ে ভালোভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা হোক যে, বাধ্যতামূলক টীকাদানের আদেশ দেওয়া হয়নি, ওটা স্বেচ্ছামূলক—কে কার কথা শোনে!''[২০]

৮ মে ১৮৯৮ মারাঠা সংবাদপত্রে কলকাতার বিবরণ : ''কয়েকদিন ধরে কলকাতায় ভয়ানক বিভীষিকার অবস্থা চলছে।... আট লক্ষ লোকের বিরাট জনসমুদ্র যেন সহসা ভয়াবহ আকারে সংক্ষুব্ধ, আলোড়িত। শহরের বাইরে পালাবার জন্য প্রচণ্ড ব্যস্ততা।... ট্রেনে, স্টীমারে, পথে—শুধু দেখা যায় প্রবাহিত বিপুল জনতরঙ্গ। কয়েকদিনের মধ্যে ২ লক্ষ মানুষ শহর ছেড়ে চলে গেছে। ধনী পর্দানশীনা মহিলাও পর্দা-বন্ধন সরিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটেছেন—মারাত্মক শহর থেকে বাঁচবার জন্য!''[২১]

ছয়

৩ মে ১৮৯৮। দার্জিলিং থেকে ফিরে সেদিনই সন্ধ্যায় বেলুড়ের নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়ির তৎকালীন মঠে প্রশ্নোত্তরের ক্লাসের পরিবর্তে এক সভার আহ্বান করেন স্বামীজী। সেই সভায় মঠবাসী ও সমবেত ভক্তদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''দেখ, আমরা সকলে ভগবানের পবিত্র নামে এখানে মিলিত হয়েছি। আমাদের মরণভয় তুচ্ছ করে এইসব প্লেগরোগীদের সেবা করতে হবে। এদের সেবা করতে, ঔষধ দিতে, চিকিৎসা করাতে আমাদের এই নূতন মঠের জমিও যদি বিক্রয় করতে হয় এবং আমাদের জীবন যদি বিসর্জন দিতেও হয়, তাতেও আমরা প্রস্তুত।''[২২] সেসময় স্বামীজী আরও বলেছিলেন, ''সর্বস্ব বিক্রী করেও এদের সেবা

করতে হবে। আমরা যে-গাছতলার ফকির ছিলাম, সেই গাছতলাতেই থাকব।"[২৩] তবে প্রয়োজনীয় অর্থ শেষপর্যন্ত অন্যসূত্রে এসে পড়ায় সেসব কিছু করার প্রয়োজন হয়নি।

৭ মে ১৮৯৮ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ব্রহ্মানন্দজীর পত্র থেকে জানতে পারি, সমুদ্রহৃদয় স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় একটা প্লেগ হাসপাতাল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছিলেন : ''কলিকাতায় Plague Panic খুব হইতেছে, অনেক লোক সহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

স্বামীজী তোমাকে বলিতে বলিলেন যে, আলাসিঙ্গাকে বলিবে যে টাকা চাহিয়াছিল press করিবার জন্য তাহা উপস্থিত হইতে পারে না, কারণ যদ্যপি plague hospital করিতে হয় তজ্জন্য অনেক খরচ হইবে..."।[২৪]

প্লেগ হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা ছাড়াও নেটিভ প্রজাদের প্রতি চরম উদাসীন ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের প্রতি সন্দেহপরায়ণ, উদ্ভ্রান্ত, ভীতসন্ত্রস্ত, পলায়নপরায়ণ জনগণকে সাহস দেবার জন্য ও রোগ বিষয়ে সচেতন করতে ওই সভায় স্থির হয় প্রথমেই বাংলা ও হিন্দি প্রচারপত্র বিতরণ করা হবে। স্বামীজীর আদেশে নিবেদিতা দুদিন ধরে ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।[২৫] সেই পাণ্ডুলিপির বাংলা করা হয় এবং স্বামীজীরই নির্দেশে স্বামী অখণ্ডানন্দ তখনই বাংলা প্রচারপত্রের হিন্দি অনুবাদ করে ফেলেন। বাংলা প্রচারপত্রে লেখা ছিল : ''মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ। জয় জগদম্বা, জয় জগদম্বা। এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, প্লেগ-আক্রান্ত রোগীদের সেবার জন্য আমরা বেলুড় মঠের কতিপয় সন্ন্যাসী ক্যাম্প বা অস্থায়ী হাসপাতাল খুলিয়াছি। উহাতে রোগিগণের নিজ নিজ ধর্মভাব রক্ষা করিয়া সেবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। টীকা দেওয়ায় প্লেগ আরও বাড়িতেছে—এ গুজব মিথ্যা, কারণ গবর্নমেন্ট কখনই প্রজা নাশ করিতে পারেন না। ইত্যাদি।"[২৬]

স্বামী অন্নদানন্দ লিখিত 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' গ্রন্থ অনুসারে প্রচারপত্রের মূল বক্তব্যের কিয়দংশ উপরে উদ্ধৃত। স্বামী অজ্ঞজানন্দ রচিত 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থে অবশ্য মূল বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যায় :

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

কলিকাতানিবাসী ভাইসকল!

১। আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী, এই দুর্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং রোগ ও মারীভয় হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের চেষ্টা ও নিরন্তর প্রার্থনা।

২। যে মহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলে ব্যস্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগ যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, কারণ তোমরা সকলে ভগবানের মূর্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের উপাসনায় কোনও প্রভেদ নাই। যে অহঙ্কারে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানতায় অন্যথা মনে করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয় ও মহাপাপ করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

৩। তোমাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা, অকারণে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইও না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থিরচিত্তে উপায় চিন্তা কর, অথবা যাহারা তাহা করিতেছে তাহাদের সহায়তা কর।

৪। ভয় কিসের? কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে বলিয়া সাধারণের মনে যে ভয় হইয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই। আর আর স্থানে প্লেগ যেরূপ রুদ্রমূর্তি হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় কলিকাতায় সেরূপ কিছুই হয় নাই। রাজপুরুষেরাও আমাদের প্রতি বিশেষ অনুকূল।

৫। এস, সকলে বৃথা ভয় ছাড়িয়া ভগবানের অসীম দয়াতে বিশ্বাস করিয়া কোমর বাঁধিয়া

কার্যক্ষেত্রে নামি, শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে জীবনযাপন করি। রোগ, মারীভয় প্রভৃতি তাঁহার কৃপায় কোথায় দূর হইয়া যাইবে।

৬। (ক) বাড়ী, ঘরদুয়ার, গায়ের কাপড়, বিছানা, নর্দমা প্রভৃতি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে।

(খ) পচা বাসি খাবার না খাইয়া টাট্‌কা পুষ্টিকর খাবার খাইবে। দুর্বল শরীরে রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

(গ) মন সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। মৃত্যু সকলেরই একবার হইবে। কাপুরুষ কেবল নিজের মনের ভয়ে বারম্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে।

(ঘ) অন্যায়পূর্বক যাহারা জীবিকা অর্জন করে, যাহারা অপরের অমঙ্গল ঘটায়, ভয় কোনকালে তাহাদের ত্যাগ করে না। অতএব এই মহা মৃত্যুভয়ের দিনে, এই সকল বৃত্তি ত্যাগ করিবে।

(ঙ) মহামারীর দিনে গৃহস্থ হইলেও কাম, ক্রোধ হইতে বিরত থাকিবে।

(চ) বাজারের গুজবাদি বিশ্বাস করিবে না।

(ছ) ইংরাজ সরকার কাহাকেও জোর করিয়া টিকা দিবেন না। যাহার ইচ্ছা হইবে সেই টিকা লইবে।

(জ) জাতি ধর্ম ও স্ত্রীলোকের পরদা রক্ষা করিয়া, যাহাতে আমাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে, নিজের হাসপাতালে, রোগীদের চিকিৎসা হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। ধনী লোক পালাক্, আমরা গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বুঝি। জগদম্বা স্বয়ং নিঃসহায়ের সহায়; মা অভয় দিতেছেন—ভয় নাই! ভয় নাই!!

৭। হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের দ্বারা যতদূর সাহায্য হয় তাহার ত্রুটি হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থসাহায্যও সম্ভব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পল্লীতে পল্লীতে মারীভয় নিবারণের জন্য নাম-সংকীর্তন করিবে।..."[২৭]

বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত। এবার প্রয়োজন এই প্রচারপত্র, কথ্যভাষায় যাকে বলে হ্যান্ডবিল—তার বিতরণ। কোথায় এই বিলিব্যবস্থা করা হবে? জনগণের মধ্যে—কলকাতার পথে পথে। কোন কোলকাতার পথে? দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ অনিশ্চয়তার পরিবেশ চারিদিকে। গভর্নমেন্ট প্লেগের টিকা দিয়ে সকলকে মেরে ফেলছেন—এই গুজব দাবানলের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান জনগণ দলবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কট্টরভাবে প্রচার চালাচ্ছে। তাদের অজ্ঞতা দূর করে সাহস দিতে হবে। প্রাণ হাতে নিয়ে পথে নামা। স্বামীজীর 'সাবাশ বাহাদুর' স্বামী অখণ্ডানন্দ হ্যান্ডবিল ছাপানো ও তার প্রচারের দায়টি গ্রহণ করলেন। এইসময় কলকাতার পথে যাতায়াত করাটাও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। কতটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নেমে পড়ে সদ্যোজাত রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনাকালের অগ্রদূতেরা তাঁদের আপাত ছোট্ট ছোট্ট পদক্ষেপগুলি ফেলেছিলেন তার খানিকটা বিবরণ পাই বেলুড় মঠ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লেখা স্বামী সুবোধানন্দের ১০.৫.১৮৯৮-এর পত্রে (রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দিরের সৌজন্যে প্রাপ্ত) :

''কলিকাতায় মাঝে প্লেগের হাঙ্গাম হয় সেজন্য সহরের বার আনা লোক সহর ছাড়িয়া পালাইয়াছে।... কলিকাতায় প্লেগের জন্য মেথর, মুর্দ্দভরাস, রাস্তা ঝাড়ুওলারা, রাস্তায় যারা জল দেয় তারা এবং অন্যান্য সরকারি গরিব চাকরে, সব পলাইয়াছে। সেজন্য কলিকাতার রাস্তা অপরিস্কার সকল জায়গায় পাইখানার দুর্গন্ধ ইত্যাদি। কলিকাতায় প্লেগের জন্য মাঝে রায়েট হইয়াছিল গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি বন্ধ হইয়াছিল। মুসলমান এবং ছোট যাত [জাত] হিন্দু সব একক্কাটা

জায়গায় জায়গায় লাঠি নিয়া দাঁড়াইয়াছিল শুনিয়াছি দুই জন ফিরিঙ্গি মেরে ফেলেছে। ট্রেন [ট্রাম] গাড়ি আটক করে ভদ্রলোকদের হাতে ধোরে নাবাইয়াছিল এবং বোলেছিল আমরা মুটে মজুরলোক ঝকড়া [ঝগড়া] কোরে মোরবো আর তোরা শালারা ফুর্ত্তি করিবি এইরকম কত যে উৎপাত সে সামান্য পত্রে আর বেশি কি জানাইব। অনেক আপিসের লোক মার খাবার ভয়ে আপিস বন্ধ করিয়াছিল। তারপর কলিকাতায় প্লেগের টিকা দেবার কথা হয়। যাহারা টিকা নেবে তাহাদের প্লেগ হাঁসপাতালে যাইতে হবে না যদ্যপি প্লেগ ধরে। সমস্ত লোক খেপে [ক্ষেপে] উঠিল যে রাস্তায় যে টিকে দিতে বেরুবে ঠেঙ্গিয়ে তার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে, বসন্ত রোগের টিকেওয়ালারা রাস্তা দিয়ে যাইতেছিল লোকে তাদের ধোরে বেদম মারে। অবশেষে পুলিসে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এইপ্রকার নানান রকম উৎপাত। অবশেষে গবর্মেন্ট থেকে ঢেড়া ফিরায় যে কাহাকেও টিকা লইতে হবে না এবং যদ্যপি কাহারো বিউবনিক Plague হয় তো তাহা হৈলে হাঁসপাতালে যাইতে হবে না। নিজের নিজের বাটীতে বাহিরে একটি পরিস্কার ঘরে রোগিকে রেখে দেওয়া হবে এবং তাহার বাটীর লোক সেবা করিবে।"

সেবারে স্বামীজী দার্জিলিং থেকে ফেরার সময় কেমন পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, ওই পত্র থেকেই জানা যায় : ''স্বামীজী যেদিন দার্জিলিং থেকে আসেন সঙ্গে ব্যাগ গাঁটরী ছিল। রাস্তার লোক বলিতে লাগিল এই ব্যাগের ভিতর টিকে দোবার ঔষধ আছে অতএব মার শালাদের। তারপর S.V. জোড় হস্তে বলিলেন বাবা আমরা ফকির লোক বিদেশ থেকে আসিতেছি। তারপর লোকে ছেড়ে দেয়।" এমতাবস্থায় স্বামী অখণ্ডানন্দ নামলেন কলকাতার পথে—প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে জনগণের ভ্রান্তি দূর করতে এবং রামকৃষ্ণ মিশন এই প্লেগসেবায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জনগণকে অবগত করতে। এই হ্যান্ডবিলগুলো ছাপাতে দিতে তাঁকে বেলুড় থেকে রওনা হয়ে বড়বাজারের একটা প্রেসে যেতে হয়েছিল।

কয়েক হাজার মুদ্রিত প্রচারপত্রের বড় একটা বাণ্ডিল নিয়ে ছাপাখানা থেকে হ্যারিসন রোডে নামামাত্র চারিদিক থেকে লোকের অসম্ভব ভিড় স্বামী অখণ্ডানন্দকে এমনভাবে চেপে ধরে যে, তাঁর প্রাণ যায় যায়। অতিকষ্টে কোনওরকমে এক-এক তাড়া হ্যান্ডবিল এক-এক দোকানের দিকে ফেলে এগোতে লাগলেন তিনি। এতে লোকে সাময়িকভাবে সেইদিকে ছুটল। এভাবে অল্প অগ্রসর হতে না হতেই সেই উদ্দাম জনস্রোত আবার প্রবলবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হল। তিনি ক্রমাগত তাড়া তাড়া বিজ্ঞাপন ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে কোনরকমে স্ট্র্যান্ড রোডে ট্যাঁকশালের কাছে পৌঁছলেন। সেখানে এসে ভিড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পরিচিত এক ভক্তের বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নেন। পরে ট্যাঁকশালের নিচে বসে সমস্ত দিন বিজ্ঞাপন বিলি করেন। দ্বিতীয়দিনেও এই স্থানে বসে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত হ্যান্ডবিল বিতরণের পর যেই ভক্তগৃহের দোতলায় উঠলেন, অমনি চার-পাঁচজন লোক দ্রুতবেগে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল ও বলতে লাগল, ''আপনি কে? কেন গভর্নমেন্টের এই অন্যায় কাজে সহায়তা করছেন?" তিনি বুঝিয়ে বলতে যাবেন, এমন সময় ভক্তটি এসে বলল, ''স্বামীজী, আপনি বৃথা চেষ্টা করবেন না, এরা বুঝবে না। আপনি হ্যান্ডবিলগুলি আমায় দিন, আর আপনি ভিতরে চলে যান, নতুবা এদের হাতে আপনার জীবন বিপন্ন।"[২৮] ভক্তটির তৎপরতায় স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রাণরক্ষা হয়। অসুস্থদেহে প্রাণান্তকর বিপদ মাথায় নিয়ে তৃতীয় দিন কালীঘাট অঞ্চলে আবার হ্যান্ডবিল বিলি করতে যান তিনি। সেখানেও

স্থানীয় লোকেরা ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাঁকে অস্থির করে তোলে। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাদের প্লেগের কারণ, কীভাবে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব—এসব বুঝিয়ে বলতে শুরু করেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? সকলে তাঁকে গভর্নমেন্টের চর—সাধুর ছদ্মবেশে প্লেগের টিকার কথা প্রচার করতে এসেছে—মনে করে নানারকম ভয় দেখাতে থাকে।[২৯] জনগণের মনে কী আত্মঘাতী অজ্ঞতা!!

যাই হোক, স্বামী সুবোধানন্দের পূর্বে উল্লিখিত পত্র থেকে জানতে পারি ছাপানো হ্যান্ডবিলগুলি শেষ পর্যন্ত বিলি করা সম্ভব হয়েছিল : ''আমাদের মঠ হইতে এই কাগচ [কাগজ] কলিকাতায় রাস্তায় রাস্তায় বিলাইবার জন্য ১০০০০ ছাপা হইয়াছিল এবং বিলানো হইয়াছে।" *(ক্রমশ)*

তথ্যসূত্র

১। K. Park, *Park's Textbook of Preventive & Social Medicines* (M/s. Banarasidas Bharot Publishers, 17th edition), p. 223

২। Ibid

৩। *উদ্বোধন*, ৬ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৫ আশ্বিন ১৩১১; *মহামারী (প্লেগ) ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ*, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম. বি.

৪। লিজেল রেমঁ, *ভারতকন্যা নিবেদিতা*, অনুবাদ : নারায়ণী দেবী (সোমলতা : কলকাতা, ২০১৫), পৃঃ ৯৩

৫। *উদ্বোধন*, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন ১৩০৫

৬। দ্রঃ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা* (সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল : কলকাতা, ১৯৮৫), পৃঃ ৭৩ : ''মিস মূলার ইতিমধ্যে দার্জিলিঙ গমন করেন এবং নিবেদিতারও দার্জিলিঙ অবস্থানের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীজী টেলিগ্রাম করিয়া নিবেদিতাকে যাইতে নিষেধ করেন। পূর্বেই তিনি ইঁহাদের লইয়া আলমোড়া প্রভৃতি যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"

৭। সম্পাদনা : স্বামী ঋতানন্দ, *স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্রসম্ভার* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৪), পৃঃ ৬৯-৭০

৮। তদেব, পৃঃ ৩৫৪

৯। স্বামী অন্নদানন্দ, *স্বামী অখণ্ডানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০১৪), পৃঃ ১৫১

১০। দ্রঃ তদেব

১১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ৩ (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০১), পৃঃ ৮৬-৮৭

১২। *Park's Textbook,* pp. 223-27

১৩। দ্রঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, খণ্ড ৪, (মণ্ডল বুক হাউস : কলকাতা, ১৪১৮), পৃঃ ৩-৪ [এরপর, *সমকালীন*]

১৪। তদেব, পৃঃ ৪

১৫। দ্রঃ তদেব

১৬। তদেব, পৃঃ ৫

১৭। তদেব

১৮। স্বামী প্রভানন্দ, *রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০৭), পৃঃ ২১০

১৯। *Ed. Sankari Prasad Basu, Letters of Sister Nivedita* (Nababharat Publishers : Calcutta, 1982), Vol I, p. 28

২০। *সমকালীন*, খণ্ড ৪, পৃঃ ১২৬-২৭

২১। সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *ধন্য বাগবাজার* (রবীন্দ্রনাথ বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট : বাগবাজার, ১৯৯৮) প্রবন্ধ : *প্লেগের কলকাতায় নিবেদিতা*, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃঃ ৭৬১

২২। *স্বামী অখণ্ডানন্দ*, পৃঃ ১৫২

২৩। তদেব, পৃঃ ১৫১

২৪। *স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্রসম্ভার*, পৃঃ ৭১

২৫। দ্রঃ *ভগিনী নিবেদিতা*, পৃঃ ৭৩

২৬। *স্বামী অখণ্ডানন্দ*, পৃঃ ১৫২

২৭। স্বামী অজ্ঞজানন্দ, *স্বামীজীর পদপ্রান্তে* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৪), পৃঃ ২৪৪-৪৫

২৮। *স্বামী অখণ্ডানন্দ*, পৃঃ ১৫৩

২৯। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৫৩-৫৪